চলো যাই আনন্দনিকেতনে

(ভ্রমণ কাহিনী সংকলন)

সোমনাথ সরকার (মুখার্জি)

গ্রন্থতীর্থ

GRANTHA TIRTHA CALCUTTA

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট

কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় শ্রী সোমনাথ সরকার পেশায় শিক্ষক ছিলেন। নেশায় লেখক এবং কবি। চমৎকার ওঁর বাচনভঙ্গি। একেবারে স্বচ্ছ। সহজ, সরল, বহতা নদীর মতো। কোথাও কোনো প্যাঁচ ঘোচ নেই। পাণ্ডিত্য জাহির করার অপপ্রয়াস নেই।

'চলো যাই আনন্দনিকেতনে' শ্রী সরকারের ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ। তাঁর নিজের ভাষায় — মনের মতো ভ্রমণগুচ্ছ। একে ভ্রমণ-কাহিনী না বলে, ভ্রমণ-কাব্য বলাই বোধকরি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। তাঁর বর্ণনার ভঙ্গি এত ঘরোয়া, এত গতিশীল যে, বইটি পড়তে শুরু করে, শেষ না করে ছাড়তে পারিনি।

কত জায়গায় ঘুরেছেন সোমনাথবাবু। কত তীর্থ, পাহাড়, নদী, সমুদ্র দর্শন করেছেন! কিন্তু তাঁর দর্শন শুধুই বাইরের চোখ দিয়ে নয়, ঈশ্বরদত্ত ভেতরের চক্ষুটি দিয়েও। তা না হলে 'দেখেও-না-দেখা' দৃশ্যপটকে তিনি এমন মুন্‌শিয়ানার সঙ্গে তুলে ধরতে পারতেন না। কথোপকথনের ছলে তাঁর ভ্রমণ কাহিনী হয়ে উঠেছে গল্প এবং উপন্যাসের মতোই প্রাণবন্ত ও সুখপাঠ্য।

এমন শক্তিমান লেখক কেন জীবনের প্রান্তভাগে এসে কলম ধরলেন জানি না। আমি তাঁর লেখা পড়ে মুগ্ধ। ঠাকুরের চরণে তাঁর সুখ-শান্তি, স্বাস্থ্যময়, আনন্দময়, বোধময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

প্রার্থনা করি, এমন সুখপাঠ্য লেখা ঠাকুর তাঁকে দিয়ে আরও লিখিয়ে নিন।

১ আষাঢ় ১৪০৯
শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির
উত্তরপাড়া

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

‘বিবিধাঞ্জলি’ গ্রন্থের মূল্যায়ন

সোমনাথবাবু একজন অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক। ই. টি. ভি. বাংলার উপাসনা বিভাগের উপস্থাপক হিসাবে পত্রপাঠের আসরে ওনার সুন্দর সুন্দর চিঠির মাধ্যমে যোগাযোগ। এরপর চন্দননগরে বারাসাতের রামকৃষ্ণ আশ্রমের এক ধর্মীয় আসরে ওনার সঙ্গে মুখোমুখিতে আলাপচারিতা। সেই সময় শ্রী সরকারের ‘বিবিধাঞ্জলি’ এবং আমার ‘মহাভারত’ বই দুটি পরস্পরের মধ্যে বিনিময় হয়। সোমনাথবাবুর ‘বিবিধাঞ্জলি’ বইটি নূতন আঙ্গিকের টক-ঝাল-মিষ্টির বিভিন্ন স্বাদের কবিতা, গল্প, রম্যরচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদিতে সমৃদ্ধ। বইটি পড়ে বেশ আনন্দ পেয়েছি এবং ভালো লেগেছে।

বইটিতে মন-মাতানো কিছু কবিতা ও ছড়া এবং সাড়া-জাগানো কিছু প্রবন্ধ সকলের প্রশংসার দাবী রাখে। কিছু গল্প ‘বনফুল’-কে স্মরণ করিয়ে দেয় আর রম্যরচনাগুলি শ্রীসঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ধাঁচে লেখা। কয়েকটির ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা সফলও হয়েছেন। সার্থক হয়েছে ওনার শ্রম।

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী

১ আষাঢ় ১৮০৯
শ্রীরামকৃষ্ণ কুটির
উত্তরপাড়া

সূচিপত্র

চলো যাই আনন্দনিকেতনে	❑	১৩
হুগলির পীঠস্থান	❑	১৭
বীরভূমের পীঠস্থান	❑	২১
ঢেউ গুনছি সাগরের	❑	২৩
ভোরের গল্প	❑	২৬
আবার আসিব ফিরে	❑	৩০
পরিবেশ পরিচিতি	❑	৪৯
অন্য কোথা অন্য কোনখানে	❑	৫১
অন্তিম ইচ্ছা	❑	৬৩

চলো যাই আনন্দনিকেতনে

শঙ্কু মহারাজকে স্মরণ করে 'চলো যাই আনন্দনিকেতনে' শীর্ষক 'মনের মতো ভ্রমণগুচ্ছ' মানুষকে জানতে ও জানাতে লিখতে শুরু করি।

নজরুলের 'থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে/ দেখব এবার জগৎটাকে।' — কবিতার এই দুটি লাইন ছোটো থেকেই আমার মধ্যে ভ্রমণের নেশা ধরিয়েছিল। কিন্তু সাধ আছে, সাধ্য ছিল না। সেই কারণে স্কুলজীবনে ভ্রমণের কোনো সুযোগ হয়নি। পরবর্তীকালে কলেজের ছাত্রাবস্থায় 'এন. সি. সি.'-র দৌলতে বিনি পয়সায় হাজারিবাগ-রাঁচির কাছে 'রামগড়' মিলিটারি ক্যান্টনমেন্টের ক্যাম্পে গিয়ে 'ক্যাম্প ফায়ার' ও হুড্রু ওয়াটার ফলস্ দেখে জীবনে প্রথম ভ্রমণের অভিজ্ঞতা হল। সে যে কী আনন্দ পেয়েছিলাম, তা ভাষায় যথাযথ প্রকাশ করতে আমি অক্ষম। এরপর শিক্ষকতার কার্যে নিযুক্ত হয়ে 'বিশ্বভারতী'-র বিনয় ভবন থেকে ১৯৬৩-৬৪ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষক-শিক্ষণ প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে স্বল্প খরচে 'বেনারস-এলাহাবাদ' ভ্রমণের সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে কোনো ভুল করিনি। সে সুখস্মৃতি আজও অমলিন আছে। স্মৃতি সতত সুখের কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তা নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'স্মৃতি তুমি বেদনার।' এখানে এসে কাশীর 'বিশ্বনাথ মন্দির', 'অন্নপূর্ণা মন্দির', 'বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' চত্বরে নবনির্মিত সুন্দর কারুকার্যখচিত বিড়লা মন্দির দেখে ও পূর্ণিমাতে কাশীর গঙ্গায় দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে নৌকাবিহার করে মুগ্ধ হয়েছিলাম। জীবনে প্রথম এই নৌকোবিহার, তাও আবার চাঁদনি রাতে! এর কদরই আলাদা। ওদিকে তখন কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজছে। এখান থেকেই সম্রাট অশোকের প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারস্থান 'সারনাথে'র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বৌদ্ধস্তূপগুলি মনের মধ্যে এক সৌন্দর্যের অনুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল। এছাড়া এলাহাবাদে গিয়ে নেহরুবংশের স্থপতি ও স্মৃতিবিজড়িত 'আনন্দভবন' দেখে আনন্দ পেলাম। এলাহাবাদে এই 'আনন্দভবন' তখন যেন 'আনন্দনিকেতনে' পরিণত। এই আনন্দনিকেতনকে ছুঁয়ে সদলবলে যমুনার উপর দিয়ে নৌকোবিহার করে চলে যায় প্রয়াগে। প্রয়াগে মস্তকমুণ্ডন ছাড়াই ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করে পুণ্য অর্জন করি। পরে 'কালকূটে'র 'অমৃতকুম্ভের সন্ধানে' পড়ে ও দেখে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে মিলিয়ে নিয়েছি ও অভিভূত হয়েছি। কথিত আছে, এই ত্রিবেণীসঙ্গমে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী যুক্ত হয়েছে, আর পশ্চিমবঙ্গে ত্রিবেণীতে ওরা মুক্ত হয়েছে। তাই কবি গেয়েছেন—

''মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালি বাস করি সেই তীর্থ বরদ বঙ্গে।''

এরপর বেশ কিছুদিন ভ্রমণ স্থগিত ছিল। শিক্ষকতার কার্যে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করে প্রধানশিক্ষকের পদমর্যাদার সুবাদে দু-দুবার প. ব. ইয়ুথ ওয়েলফেয়ারের যুবকল্যাণ দপ্তরের সহায়তায় কম খরচে দার্জিলিং ও পুরী ভ্রমণ সম্ভব হয়েছিল। দলে ছাত্র-শিক্ষক মিলে সর্বসাকুল্যে ৫৫/৫৬ জন ছিল। পর্বত-সুন্দরী দার্জিলিং যাবার সময় টয় ট্রেনে যাওয়া ও 'টাইগার হিল' থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘায় সূর্যোদয় দেখার যে কী আনন্দ, সেটা আজও ভুলতে পারিনি। অবশ্য মাঝে-মধ্যে ধস নামে, কুয়াশায় আচ্ছন্ন করে রাখে। আর পুরীর উথালি-পাথালি ঢেউ, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত

কাঞ্চনজঙ্ঘা (দার্জিলিং)

মনকে বেশ নাড়া দেয় ও কাব্যিক প্রেরণা জোগায়। (পুরী ভ্রমণের বর্ণনা পরে দ্রষ্টব্য)। এছাড়া দীঘা, সাম্প্রতিককালের নিউ দিঘা, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী, গঙ্গার দুই তীরে দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দির ও বেলুড়মঠ, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দির, ১০৮ শিবমন্দির, গোলাপবাগ (নেক্সট্ টু গ্লাসগো), চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর মন্দির, মহিষমর্দিনী মন্দির (ধরমপুরে) ব্যাণ্ডেল চার্চ, ইমাম বাড়া, মায়াপুরের ইস্কন (এখানে যাওয়ার পথে শান্তিপুরে শান্তি, এবং কৃষ্ণনগরে কৃষ্ণ খুঁজে না পেয়ে 'এ মায়া প্রপঞ্চময়' — মনে করে ইস্কনে কৃষ্ণকে খুঁজে পেয়ে সস্ত্রীক পরম শান্তিতে রাত্রিযাপন করেছিলাম), মাইথন ড্যাম ও কল্যাণেশ্বরী, চিত্তরঞ্জনে রেলওয়ে কারখানা, বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন টেরাকোটার মন্দির, ছিন্নমস্তার মন্দির, বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়, কলকাতার নিক্কোপার্ক, সায়েন্স সিটি, চিড়িয়াখানা, সুন্দরবন অঞ্চলের হরিণ ও ব্যাঘ্র প্রকল্প, জলপাইগুড়ির জলদাপাড়ার অভয়ারণ্য, কোচবিহারের রাজবাড়ি, ভুটানের বৌদ্ধমন্দির, পাশেই বহতা তিস্তার স্বচ্ছ কনকনে ঠাণ্ডা জলে স্নান, করে গরমকালে বেশ আরাম পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের পলাশীর প্রান্তর

(যেখানে যুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বাংলা-বিহার-উড়িয্যার স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লার পরাজয় ঘটেছিল এবং স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয়েছিল), হাজারদুয়ারী ইত্যাদি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি অবশ্যই মনের মধ্যে এক বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে।

অবসরগ্রহণের পর হাতে কিছু টাকাকড়ি আসায় একে একে ভ্রমণপর্ব চলতে থাকে ও স্থানীয় পাক্ষিক পত্রপত্রিকায় ছবিসহ বিবরণ লিখতে থাকি। এর মধ্যে হুগলি ও বীরভূমের পীঠস্থান, পুরীভ্রমণ, হরিদ্বার-হৃষিকেশ, দেরাদুন-মুসৌরি, মথুরা-বৃন্দাবন, আগ্রা-দিল্লি ইত্যাদি। এখানে-সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা সেগুলিকে একত্রিত করে আমার মনের মতো ভ্রমণগুচ্ছ 'চলো যাই আনন্দনিকেতনে' আপনাদের হাতে তুলে দিতে পারায় ভীষণ আনন্দ পাচ্ছি। ভালো লাগলে ভাবব আমার শ্রম সার্থক হয়েছে। এই সুযোগে স্থানীয় পত্রপত্রিকা যথা— ভ্রমণবার্তা, হুগলি সংবাদ, পরিস্থিতি, মনতর্পণ, আকাশবার্তা ইত্যাদির সম্পাদকবৃন্দ, প্রধানশিক্ষক সমিতির বুলেটিন সম্পাদক ও স্কুল ম্যাগাজিন 'সৃজনী'র সম্পাদক — সকলকে ধন্যবাদ জানাই। ছাপার সঙ্গে যুক্ত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আর ছোটো করতে চাই না। পরিশেষে জানাই, পাঠক-পাঠিকাদের ভ্রমণ-পিপাসা মেটাতে বা ভ্রমণে উৎসাহিত করতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। স্রেফ ভ্রমণের টানটান আকর্ষণেই ভ্রমণ-পিপাসু পাঠক-পাঠিকা স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই বইটি হাতে

হংসেশ্বরী মন্দির

পেলেই নিমেষে আদ্যন্ত পড়ে ফেলবেন — এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ বা দ্বিমত নেই।

ভ্রমণ। শিক্ষামূলক ভ্রমণ। এর মধ্যে তীর্থভ্রমণে মন্দির, মসজিদ যেমন আছে, পাহাড়-সমুদ্র-নদী ও সমতলের নৈসর্গিক দৃশ্যবলীও স্থান পেয়েছে। ভ্রমণে মনের আভবিলতা দূর হয়। মনের প্রসারতা, উদারতা বৃদ্ধি পায়। ভ্রমণ মানে হল ভুল-ভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাওয়া, সূর্যের আলোর মতন জ্ঞানের প্রকাশ পাওয়া। ভ্রমণে ভক্তি, মুক্তি

দুইই পাওয়া যায়। পুরুষ আর প্রকৃতিকে নিয়ে এই জগৎ-সংসার পুরুষ প্রকৃতিকে আঁকড়ে থাকে। তাই ভ্রমণের নেশা জাগে অন্তরে। চোখে দেখা আর কানে শোনা — এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কমাতে এবং দুয়ে দুয়ে যে চার হয় — এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটা মিলিয়ে নিতে বেরিয়ে পড়ি ভ্রমণে। ঘাটে- আঘাটায়, মন্দিরে-মসজিদে, সাগর-নদীতে, পাহাড়-পর্বতে-গুহাতে গৃহীজীবন থেকে শতেক যোজন দূরে এক শান্তি বা প্রশান্তি খুঁজে পেতে বেরিয়ে পড়ি ভ্রমণে।

বাঙালি ভ্রমণপ্রিয় জাতি। সুদূরের পিয়াসি হিসাবে সুযোগ ও ছুটি পেলে পাড়ি জমায় দূরদূরান্তে। বেরিয়ে পড়ে জানার নেশায়— নতুন নতুন দেশ ও জায়গার সন্ধানে। আর সুযোগ পেলে জায়গার বৈশিষ্ট্য ও রমণীয় জিনিসের চিত্র ও নথিপত্র নিজেদের ডায়েরি ও ছবির সাহায্যে সংরক্ষণ করে রাখে। এ হেন ভ্রমণ-পিয়াসি যাত্রী হিসাবে বিভিন্ন জায়গার ছবিসহ বিবরণ দিতে সচেষ্ট হয়েছি। কতখানি সফল হয়েছি তার বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকার উপর রইল।

সবশেষে বইটির শুভদ ভূমিকা এবং 'বিবিধাঞ্জলি' গ্রন্থটির মূল্যবান মূল্যায়নের জন্য সাধুবাদ ও ধন্যবাদ জানাই বিশিষ্ট লেখক ও ই. টি. ভি. বাংলার উপাসনা বিভাগের প্রখ্যাত উপস্থাপক শ্রদ্ধেয় বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী মহাশয়কে।